ধর্মের উপযোগীতা

মুক্তমনা প্রকাশনী

www.mukto-mona.com

মূল প্রবন্ধঃ * ডঃ রিচার্ড ডকিনস (প্রফেসর, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি)
অনুবাদ*ঃ মুক্তমনা প্রকাশনীর পক্ষ থেকেঃ বন্যা আহমেদ, জাহেদ আহমদ, অভিজিৎ রায়

(ডঃ রিচার্ড ডকিনসের এই প্রবন্ধটি ইংরেজীতে সর্বপ্রথম *Free Inquiry* ম্যাগাজিনের ২৪নাম্বার ভল্যুমের ৫ নাম্বার ইস্যু তে 'What Use is Religion?' শিরনামে প্রকাশিত হয়। প্রকাশকের অনুমতি সাপেক্ষে প্রবন্ধটি বাংলায় অনুবাদ করা হল। বাংলা অনুবাদের স্বত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে *মুক্তমনা* *(www.mukto-mona.com)* কর্তৃক সংরক্ষিত। *মুক্তমনা*র পুর্ব অনুমতি ব্যতিরেকে এ রচনার সম্পূর্ণ, অথবা আংশিক প্রকাশ সম্পূর্ণ বেআইনী বলে গণ্য হবে। ধন্যবাদ।)

আমাদের চারপাশে ধর্মচর্চার নামে কি অপরিসীম অপচয়ই না করা হয় - একজন ডারউইনবিদ হিসেবে ধর্মের এই লাগামহীন অপব্যয়িতার দিকটি আমাকে ভাবিয়ে তোলে। প্রকৃতি অত্যন্ত মিতব্যয়ী, সে প্রতিটি মুহুর্তের, প্রতিটি পাই পয়সার হিসেব রাখে, নগন্য অপচয়কেও ছেড়ে দেয় না। কোন বন্য প্রাণী যদি তার স্বভাবগত কারণে অর্থহীন অপ্রয়োজনীয় কাজে ব্যস্ত থাকে, প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural Selection) ঠিকই তার থেকে যোগ্যতর কোন প্রতিদ্বন্দ্বীকে বেছে নেয় যে বংশবৃদ্ধি এবং টিকে থাকার কাজকেই বেশী গুরুত্ব দিচ্ছে। প্রকৃতি অর্থহীন বিলাসিতাকে প্রশ্রয় দেয় না। যদিও এত স্পষ্টভাবে আমরা সবসময় তা দেখতে পাই না, প্রকৃতি কিন্তু তার এই নির্মম গতিতেই এগিয়ে চলে।

কিছু পাখী আছে যারা পিঁপড়ার বাসায় পাখা ডুবিয়ে দিয়ে স্নান (Anting) করে - দেখলে মনে হবে যেনো পিঁপড়েগুলোকে দিয়ে তারা তাদের পাখা আক্রমণ করাচ্ছে। হয়তো বা এর

পিছনে পাখা থেকে জীবানু ঝেড়ে ফেলার মত কোন স্বাস্থ্যগত কারণ রয়েছে: কিন্তু, এই ধরনের কাজের আদৌ কোন উপকারিতা আছে কিনা তা সম্পর্কে কেউ নিশ্চিত নয়। তবে এই ধরনের অনিশ্চয়তা একজন ডারউইনবিদকে এসব কর্মকান্ডের পিছনে কোন ভালো কারণ থাকতেও পারে - তা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করা থেকে বিরত করতে পারে না।

মানুষ নামের দ্বিপদী জীবরা ধর্মচর্চার পিছনে প্রচুর সময় ব্যয় করে, ব্যয় করে প্রচুর সম্পদও। মধ্যযুগে শত শত বছর ধরে অসংখ্য মানুষের শ্রমের বিনিময়ে চার্চগুলো নির্মিত হয়েছে। মধ্যযুগ এবং রেঁনেসার সময়কার অধিকাংশ মেধাই ব্যয়িত হয়েছে পবিত্র ধর্মীয় সংগীত এবং চিত্রকল্প রচনায়। খুবই কাছাকাছি আরেকটি ধর্মের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের অপরাধে হাজার হাজার - এমনকি লক্ষ লক্ষ মানুষকে অত্যাচারের সম্মুখীন হতে হয়েছে, মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। ধর্মপ্রাণ মানুষেরা তাদের দেবতাদের জন্য প্রাণ দিয়েছে, হত্যা করেছে, উপবাস করেছে, চিরকুমারত্ব বরণ করেছে, এমনকি সমাজচ্যূতও হয়েছে।

বিভিন্ন বিষয়ে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য থাকা স্বত্তেও, পৃথিবীতে এমন কোন সমাাজব্যবস্থা নেই যেখানে কোন না কোন ধরনের সময় এবং অর্থ অপচয়ী, বিদ্বেষ সৃষ্টিকারী, বংশবৃদ্ধিরোধকারী ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের অস্তিত্ব দেখা যায় না। এই বিষয়টি ডারউইনবাদে বিশ্বাসী যে কারও জন্য একটা বড় রকমের ধাঁধার মত। আমরা যেভাবে পাখীদের অ্যন্টিং এর উদ্দেশ্যটা অনুমান করেছি, ধর্মও কি ডারউইনবাদীদের সামনে একই ধরনের চ্যালেঞ্জ উপস্থাপন করে না - যার অনুরূপ একটা যৌক্তিক ব্যাখ্যা দেওয়া আজ খুবই প্রয়োজন? আমরা কেন প্রার্থনা করি, কেনই বা আমরা এত জাঁকজমকপূর্ণ ধর্মীয় আচার আচরন পালন করে আমাদের সারাটা জীবনই উৎসর্গ করে দেই?

ধর্মীয় আচরণ তখনি ডারউইনবাদের মাথাব্যথা হয়ে দাড়ায় যখন তা অদ্ভুত কোন ব্যতিক্রম না হয়ে বহুলভাবে স্বীকৃত একটি ব্যাপারে পরিনত হয়। আপাতদৃষ্টিতে, ধর্ম সার্বজনীন, এবং শুধুমাত্র বিভিন্ন সমাজে এর বিভিন্ন রূপ আছে বলেই সমস্যাটি আপনা-আপনি দূর হয়ে যাবে না। ভাষার মতই ধর্ম মূলত সার্বজনীন এবং অঞ্চলভেদে এই বিশ্বাসের তারতম্যও অত্যন্ত লক্ষ্যনীয়। এই প্রবন্ধের বেশীরভাগ পাঠকই স্বীকার করবেন যে আমাদের মধ্যে সবাই ধার্মিক নন। কিন্তু তারপরও ধর্ম মানব সমাজে সর্বজনস্বীকৃত: পোষাক পরিধানের কিংবা খাবার পরিবেশনের রীতির মতই প্রত্যেকটি সমাজে বিশেষ ধর্মীয় রীতিও প্রচলিত রয়েছে; এমনকি যারা ধর্মচর্চা করেন না, তারাও সেটাকে সামাজিক নিয়ম হিসেবেই মেনে চলেন। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, আসলেই ধর্ম ঠিক কি কাজে লাগে?

ধর্মীয় বিশ্বাস যে মানুষকে টেনশনজনিত (stress-related diseases) অসুখ থেকে মুক্তি দিতে পারে- এই ধারণারটির পিছনে তেমন কোন প্রমাণ খুজে পাওয়া যায় না। কিন্তু এটা

সত্যি হলেও আমাদের অবাক হওয়ার মত কিছু থাকবে না। ডাক্তারদের চিকিৎসার একটা লক্ষনীয় অংশই হচ্ছে স্বান্তনা এবং আশ্বাস প্রদান। আমার ডাক্তার মাথায় হাত বুলিয়ে চিকিৎসা করেন না, কিন্তু অনেক সময়ই মনে হয় যে তার স্টেথোস্কোপ পড়া বুদ্ধিদীপ্ত চেহারার আশ্বাস বাণী শুনেই আমার ছোটখাটো অনেক অসুখ ভালো হয়ে গিয়েছে। রোগীর মন রক্ষার জন্য মিথ্যা ওষুধ দেওয়ার ব্যাপারটি (placebo effect) সবাই জানেন। অনেক সময় ওষুধীয় গুনাবলীহীন এইসব নকল বড়ি (dummy pills) খেয়েই দেখা যায় রোগীরা ভাল হয়ে যায়। সেই জন্যই নতুন ওষুধের ট্রায়ালের সময় প্লাসিবো ব্যবহার করা হয়। প্ল্যাসিবোর মত হোমিয়প্যাথি ওষুধেও রোগ সেরে উঠতে দেখা যায়, অথচ হোমিওপ্যাথি ওষুধ তৈরী করার সময় এগুলোকে এতই পাতলা করে ফেলা হয় যে তাতে রোগ সারানোর কোন উপাদানই আর অবশিষ্ট থাকে না।

ধর্মও কি, প্ল্যাসিবোর মতই, মনের স্ট্রেস কমিয়ে মানুষের আয়ু বাড়িয়ে তোলে? হয়তো করে, কিন্তু তত্ত্বটিকে সংশয়বাদীদের সাথে পরীক্ষায় উপণীত হতে হবে যারা মনে করেন অনেক ক্ষেত্রেই ধর্ম অশান্তি তো কমায়ই না বরং বাড়িয়ে তোলে। আমার মতে ধর্মের মত একটি বিশাল এবং সার্বজনীন একটি বিষয়কে ব্যাখ্যা করার জন্য এটি একটি অত্যন্ত দুর্বল তত্ত্ব। আমাদের পূর্বসুরীদের মনের অশান্তি কমিয়ে তাদেরকে দীর্ঘজীবি করার মাধ্যমে ধর্মের উৎপত্তি হয়েছিলো বলে আমি মনে করি না। এই ধরনের থিওরী ধর্মের মত এতো বড় একটি ব্যাপারকে ব্যখ্যা করার জন্য আদৌ যথেষ্ট নয়।

অন্যান্য তত্ত্বগুলো এ সম্পর্কিত ডারউইনীয় ব্যাখ্যা সম্পর্কে মোটেও ওয়াকিফহাল নয় বলে মনে হয়। উদাহরণ হিসেবে নীচের কথাগুলি বিবেচনা করা যাক। ‘ধর্ম মহাবিশ্ব সম্পর্কে আমাদের কৌতূহলের নিবৃত্তি ঘটায় এবং মহাবিশ্বে আমাদের অবস্থানের বিষয়টি তুলে ধরে’, কিংবা ‘ধর্ম সান্ত্বনাদায়ক। মানুষ মৃত্যুকে ভয় পায় এবং ধর্ম আমাদের আশ্বস্থ করে আমরা অমর থাকবো।’এ সমস্ত কথায় মনস্তা তাত্ত্বিক সত্য থাকতে পারে, কিন্তু এ গুলি কখনোই ডার উইনীয় ব্যাখ্যা হতে পারে না। এ কথাটিই স্টিভেন পিংকার উল্লেখ করেছেন তার ‘মন যে ভাবে কাজ করে’ (How the Mind Works, Penguin, ১৯৯৭) বইতেঃ

> *‘....এটি কেবল প্রশ্নের ই জন্ম দেয় যে মন কেন এমনভাবে বিকশিত হবে যেখানে তাকে স্পষ্ট মিথ্যার আশ্রয় নিতে হবে। বরফ শীতল পরিবেশে একজন মানুষ মনে মনে ’আমি উষ্ণতায় আছি’ ভাবলেই আরাম পাবে না; তেমনি সিংহের মুখোমুখি একজন মানুষ সিংহকে খরগোস কল্পনা করলেই তার মনের সমস্ত ভীতি দূর হয়ে যাবে না।’ (পৃষ্ঠা ৫৫৫)।*

মৃত্যু ভয় সম্পর্কিত ডারউইনীয় তত্ত্বের স্বরূপটি হওয়া উচিৎ এ রকমঃ ‘পরকালে বিশ্বাসের ব্যাপারটি গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে যখনই এটাকে পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়।’ এ বিষয়টি সত্য, কিংবা মিথ্যা হতে পারে। অথবা হতে পারে- এটি মানসিক চাপ এবং রোগীর মন রাখার জন্য মিথ্যা ঔষধ সম্পর্কিত আরেকটি তত্ত্ব- কিন্তু আমি সে বিষয়ে বিশদ ব্যাখ্যায় এখন যাচ্ছি না। আমার মূল বক্তব্য হচ্ছে, একজন ডারউইনবিদের সবসময় এ রকম ভাবেই প্রশ্ন উত্থাপন করা উচিৎ।

কোন কোন মানুষ বিশ্বাসের সাথে একমত পোষণ করেন এবং কেউ কেউ দ্বিমত পোষণ করেন- এমন সব মনস্তাত্ত্বিক বক্তব্য কেবল মাত্র *তাৎক্ষণিক*, কোন *চূড়ান্ত* ব্যাখ্যা নয়। একজন ডারউইনবিদ হিসেবে আমি চূড়ান্ত প্রশ্নগুলির ব্যাপারেই আগ্রহী।

ডারউইনবিদদের কাছে *তাৎক্ষণিক* আর *চূড়ান্তের* পার্থক্যের ব্যাপারটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। তাৎক্ষ ণিক প্রশ্নগুলি আমাদেরকে শরীরবিদ্যা (physiology) আর মস্তিষ্ক-অংগ বিজ্ঞানের (neuroanatomy) দিকে ধাবিত করে। তাৎক্ষনিক উত্তরে ভুল কিছু নেই, এগুলি গুরুত্বপূর্ণ, এবং বৈজ্ঞানিক।

কিন্তু আমার কাছে আগ্রহের বিষয় হচ্ছে ডারউইনীয় চূড়ান্ত ব্যাখ্যার ব্যাপারটি। বিজ্ঞানীরা যদি কখনো মস্তিষ্কে ‘সৃষ্টিকর্তা কেন্দ্র’ নামক কোন কিছুর আদৌ সন্ধান পান, আমার মত ডারউইনবিদের কাছে তখন জিজ্ঞাসার বিষয় হবেঃ ‘সৃষ্টিকর্তা কেন্দ্র’ টি কেন বিকশিত হয়েছে। কেন আমাদের সেই সমস্ত পূর্ব পুরুষ যারা বংশগত নীতির (genetics) বদৌলতে ‘সৃষ্টিকর্তা কেন্দ্র’ পেয়েছে, তারা কেন টিকে থাকতে পেরেছে তাদের প্রতিপক্ষের তুলনায়, যাদের মস্তিষ্কে ‘সৃষ্টিকর্তা কেন্দ্র’ বিকশিত হয়নি? চূড়ান্ত ডারউইনীয় প্রশ্নগুলি কিন্তু মস্তিষ্ক বিজ্ঞানের তাৎক্ষণিক প্রশ্নের তুলনায় বেশী ভাল, গভীর কিংবা বিজ্ঞানসম্মত নয়। তবুও আমি এখানে এই প্রশ্নগুলিই আলোচনা করছি।

কেউ কেউ অভিযোগ করেছেন, চূড়ান্ত ব্যাখ্যার বিষয়টি আসলে দলগত বাছাই তত্ত্বেরই (group selection theories) অন্য রূপ। দলগত নির্বাচন একটি বিতর্কিত ধারণা যেখানে বলা হয় ডারউইনীয় নির্বাচন ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত দল থেকে বাছাই করে থাকে, আবার সাধারণ ডারউইনীয় তত্ত্ব অনুযায়ী দেখা যায় এটি গোষ্ঠির মধ্যকার ব্যক্তি পর্যায় থেকে বাছাই করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় - কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃ-তত্ত্ববিদ (anthropologist) কলিন রেনফ্রিউ ধারনা পোষণ করেন যে খ্রীস্টান ধর্ম টিকে থেকেছে এক ধরনের দল গত বাছাইয়ের মাধ্যমে কারণ তাঁরা নিজেদের মধ্যে বিশ্বস্ততা এবং ভ্রাতৃত্বশীল ভালবাসার বিষয়টি লালন করে। আমেরিকান বিবর্তনবাদী ডেভিড স্লওয়ানও একই রকমতত্ত্বে বিশ্বাসী।

দলগত বাছাই তত্ত্ব ধর্মের ক্ষেত্রেও যে কাজ করতে পারে সেটির একটি কাল্পনিক উদাহরণ দিচ্ছি। ধরা যাক- একটি উপজাতি অত্যন্ত পরাক্রমশালী যুদ্ধের দেবতা বা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে। পাশাপাশি আরেকটি উপজাতি শান্তি ও পরমসহিষ্ণুতার দেবতায় করে, কিংবা তাদের আদৌ কোন দেবতা বা ঈশ্বর নেই। প্রথম দলটি দ্বিতীয় দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করেছে। এ ক্ষেত্রে যে সব যোদ্ধারা বিশ্বাস করেছে যে যুদ্ধে 'শহীদ' হলে তারা সরাসরি স্বর্গে পোঁছে যাবে, তারা বেশি সাহসিকতা ও মনোবলের সাথে যুদ্ধ করবে এবং নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিতে কুন্ঠিত হবে না। কাজেই এমন একটি উপজাতির আন্তঃগোত্রীয় বাছাইয়ে টিকে থাকার সম্ভাবনা অধিক; তারা তখন পরাজিত উপজাতির গবাদি পশু ছিনিয়ে নেবে, তাদের স্ত্রীলোকদের লুট করে উপপত্নীতে পরিনত করবে। এই রকম উপজাতি ক্রমান্বয়ে বংশবৃদ্ধি করতে থাকবে, একই বৈশিষ্ট সম্পন্ন নূতন জাতির জন্ম দেবে যারা সেই একই যুদ্ধবাজ দেবতা, বা ঈশ্বরে বিশ্বাসী। এখানে পাঠকের খেয়াল রাখা উচিৎ - **আমি যা বলছি সেটি কিন্তু 'যুদ্ধ বাজ ধর্ম টিকে থাকে' বলার চাইতে আলাদা। অবশ্যই সেটি টিকে থাকবে, কিন্তু এখানে আসল বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে- গোত্র যারা যুদ্ধের দেবতায় বিশ্বাসী তারাই টিকে থাকে।**

দলগত বাছাই তত্ত্ব নিয়ে জোড়ালো রকমের আপত্তি রয়েছে। সেগুলি সব খন্ডানো এই প্রবন্ধের পরিধির বাইরে। গাণিতিক মডেল দেখিয়েছে - বিশেষ কিছু অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দল গত বাছাই তত্ত্ব কাজ করতে পারে। বলাবাহুল্য, উপজাতির গোত্রের ক্ষেত্রে ধর্ম সেই বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে কাজ করেছে। এটি একটি অত্যন্ত মজাদার তত্ত্ব কিন্তু এখানে আমি এ বিষয়ে বিষদ বর্ণনায় যাব না।

ধর্ম কি কোন সাম্প্রতিক ব্যাপার? আমাদের জীণ (বংশগতি উপাদানের একক) বেশির ভাগ প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ফেলার পর কি এর উদ্ভব হয়েছে? ধর্মের সর্বব্যাপিতা এই তত্ত্বের যে কোন সরলীকরনের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। তথাপি, এটির একটি

বড় দিক রয়েছে যেটি আমি এখানে তুলে ধরব। আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে দলগত বাছাই বা নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যে বৈশিষ্টগুলি স্থান করে নিয়েছিল সেটি প্রকৃত প্রস্তাবে ধর্ম নয়। এর অন্যান্য উপকারিতা ছিল, এটি ঘটনাক্রমে আজকে আমাদের সামনে ধর্মীয় আচরণ হিসেবে প্রতীয়মান হচ্ছে। ধর্মীয় আচার-আচ রণের ব্যাপারটি কেবল তখনি আমাদের কাছে স্পষ্ট হবে, যখন আমরা প্রশ্নটিকে অন্যভাবে উপস্থাপন করতে সক্ষম হব।

মুরগী এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হতে পারে। সবল মুরগীদের দুর্বল মুরগীকে ঠোকরানোর ব্যাপারটি ('pecking order')অনেকেই লক্ষ্য করে থাকবেন। *এই'দলগত প্রভাবশালীতা' ('dominance hierarchy')*র ধারণাটি প্রথম মুরগীদের মধ্যেই আবিষ্কৃত হয়েছিল। প্রতিটি মুরগী শিখে নেয় কোনটিকে সে লড়াইয়ে হারাতে পারবে এবং কোনটি তাকে হারানোর ক্ষ মতা রাখে। যে দলে এই *'প্রভাবশালীতা'* সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে সেখানে প্রকাশ্য লড়াই দেখা যায় না বললেই চলে। এরকম গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত পাকাপোক্তভাবে আসন গাড়া মুরগীরা, ঘন ঘন দল বদল করা অন্যান্য দুর্বল মুরগীদের চাইতে বেশী ডিম পাড়ে। এ ব্যাপারটিতে *দলগত প্রভাবশালীতার* উদাহরণ দেখা যায়; কিন্তু এটি কোন আদর্শ ডারউইনবাদ নয়; কারণ, এটি একটি দলগত ব্যাপার। দলগত উৎপাদনশীলতার ব্যাপারটি হয়তো কৃষকের কাছে গুরুত্বপূর্ণ; কিন্তু অস্বাভাবিক কোন ব্যতিক্রম ছাড়া প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বের ক্ষেত্রে এর কোন উপযোগিতা নেই বললেই চলে।*'দলগত প্রভাবশালীতা'* তত্ত্বটি টিকে থাকার সংগ্রামে কতটুকু মূল্যবান?'- একজন ডারউইন বিদের কাছে এ প্রশ্নের কোন গুরুত্ব নেই। এ ক্ষেত্রে সঠিক প্রশ্নটি হওয়া উচিত : 'ব্যক্তি পর্যায়ে শক্তিশালী মুরগীর বিরুদ্ধাচারণ করে টিকে থাকার সংগ্রামের মূল্য কত টুকু, কিংবা অপেক্ষাকৃত দুর্বল মুরগীদের থেকে আলাদা হয়ে না থাকার ক্ষতি তাকে কতটুকু পোষাতে হয়?' **ডার উইনবাদে প্রাসংগিক প্রশ্নগুলিকে এমনভাবে ব্যক্তি পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে যাতে সেখানে বংশগত বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতা (genetic variations) দেখা যায়। এখানে আলাদা আলাদা ভাবে এক একটি মুরগীর মারমুখী প্রবণ তার বিষয় টি গুরুত্বপূর্ণ, কেন না প্রত্যকটি মুরগীর মধ্যে বংশগত বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতা আছে। কিন্তু*দল গত প্রভাবশীলতা*র ক্ষেত্রে বংশগত বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতা (genetic variations) বিষয়টি আবান্তর, কেন না - দলের কোন জীণ (gene) নেই। তা আছে কেবল ব্যক্তি পর্যায়ে।**

উপরের উদাহরণ দিয়ে আমি এটাই বোঝাতে চাচ্ছি যে ধর্মও দলগত প্রভাবশীলতার মত একটি বিষয় হতে পারে। **'টিকে থাকার সংগ্রামে ধর্মের ভূমিকা কত টুকু?' এই প্রশ্নটিই হয়ত ভুল। আমার মতে সঠিক প্রশ্নটি হওয়া উচিত: 'ব্যক্তি পর্যায়ে মানুষের মধ্যে যে সব ব্যবহার বা মনস্তাত্ত্বিক আচরণ লক্ষ্য করা যায় - যে গুলিকে নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে আমরা ধর্ম বলি; টিকে থাকার সংগ্রামে এগুলির গুরুত্ব কত টুকু?' সঠিক উত্তর খোঁজার আগে আসলে প্রশ্নটিকে সঠিক ভাবে দাঁড় করানো খুবই জরুরী।** ডারউইনবিদদের মধ্যে যারা কেবল ধর্মের টিকে

থাকার কারণ খোঁজার মধ্যেই ব্যস্ত রয়েছেন, তারা আসলে ভুল প্রশ্ন করে যাচ্ছেন। এর বদলে বরং আমাদের পূর্বপুরুষদের সময় থেকে চলে আসা এমন কিছু বিবর্তনশীল বিষয় নিয়ে ভাবা উচিৎ যেগুলো তাঁদের সময় ধর্ম হিসেবে বিবেচিত না হলেও পরবর্তীতে সভ্যতার পরিবর্তনের সাথে সাথে ধর্মীয় উপাদান হিসেবে খুঁটি গেড়ে বসেছে।

আমি এই প্রবন্ধে মুরগীদের ঠোকরানোর ধারা নিয়ে কিছু উদাহরণ হাজির করেছি। আসলে এ ব্যাপারটি আমার থিসিসের একেবারের মূল বিষয়; তাই একই বিষয়ে আরেকটি উদাহরণ দেওয়ার লোভ সামলাতে পারছি না বলে পাঠকদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। মথেরা যখন প্রজ্জ্বলিত আগুনের উপর ঝাপিয়ে পড়ে, এটাকে কেউ স্রেফ দুর্ঘটনা বলে মনে করেন না। দেখলে মনে হবে তারা যেন উড়তে উড়তে আগুনে আত্মাহুতি দিচ্ছে। এটাকে আমরা মথদের 'আত্মবিনাশী আচরণ' হিসেবে গন্য করতে পারি আর বিস্মিত হতে পারি এই ভেবে যে ডারউইনীয় প্রাকৃতিক নির্বাচন কিভাবে এমন একটি আত্মবিনাশী কাজকে সমর্থন করতে পারে! আমার কথা হচ্ছে এই সমস্যাটি থেকে একটা বুদ্ধিদীপ্ত উত্তর আশা করার আগে প্রশ্নটিকে বরং ঘুরিয়ে নতুন করে লেখা উচিৎ। এটা মোটেও আত্মাহুতি নয়। আসলে অনভিপ্রেত পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার ফলাফল হিসেবেই আমরা এই আপাতঃ আত্মাহুতির ব্যাপারটি দেখে থাকি।

কৃত্রিম আলোগুলো আমাদের রাতের দৃশ্যপটে অতি সাম্প্রতিক সংযোজন। এর আগে রাতের আলো বলতে শুধু চাঁদ আর তারাদেরই বোঝাতো। আলোর এই উৎসগুলো প্রায় অসীম দূরত্বে থাকার কারণে এদের কাছ থেকে আলো এসে পৌঁছোয় সমান্তরাল পথে, ফলে তৈরী হয় এক আদর্শ দিকদর্শন যন্ত্র। আকাশের এই আলোক উৎসগুলোকে পতঙ্গেরা সরল পথে চলবার জন্য ব্যবহার করে থাকে। পতঙ্গদের স্নায়ুতন্ত্রগুলো একটি সরল নিয়ম অনুসরণ করে অভিযোজিত হয়েছে - *"এমন ভাবে পথ চল যেন, আলো এসে তোমার চোখে ৩০ ডিগ্রী কোনে আঘাত করে।"* যেহেতু পতঙ্গদের চোখগুলো যৌগিক (পুঞ্জাক্ষি), এই ব্যাপারটা একটা বিশেষ ধরনের ওমাটিডিয়ামের (পুঞ্জাক্ষির কেন্দ্রে এক ধরনের বিশেষ টিউব) জন্য খুবই সহায়ক।

কিন্তু এই আলোক দিকদর্শনযন্ত্রটি আলোর উৎসগুলোর অসীম দূরত্বে থাকার উপর খুব গভীর ভাবে নির্ভরশীল। যদি তা না থাকে, তবে আলোক রশ্মিগুলো সমান্তরাল রইবে না, বরং অনেকটা সাইকেলের চাকার স্পোকগুলোর মত বিভাজিত হয়ে যাবে। যে স্নায়ুতন্ত্র ওই ত্রিশ ডিগ্রীর সাধারণ নিয়মে অভ্যস্ত হয়ে গেছে, সেটি মথকে একটি লগারিদমিক সর্পিল পথে ঠেলে আগুনের শিখার উপর নিয়ে ফেলবে। শ'য়ে শ'য়ে মথ যখন প্রতিদিন চাঁদ বা তারা বা দুরের শহরের আলোর উপর নির্ভর করে নিখুতভাবে দিক নির্নয় করে চলতে থাকে তখন আমরা তা আর খেয়াল করি না। আমরা শুধু দেখি মথগুলো আগুনের দিকে ঝাপিয়ে পরছে, আর তা দেখে আমরা ভুল প্রশ্ন করে যেতে থাকি - 'কেন সব মথগুলো আত্মহুতি দিয়ে

চলেছে?’

এই শিক্ষাগুলোকে মানুষের ধর্মীয় ব্যবহারের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যায়। অসংখ্য মানুষ, এমনকি কোন কোন জায়গায় শতকরা একশজন মানুষ, এমনসব বিশ্বাস পোষন করে যা শুধু বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণযোগ্য তথ্যেরই পরিপন্থি নয়, আরেকটি প্রতিদ্বন্দী ধর্মের সাথে তার বিরোধিতাও অত্যন্ত প্রকট। তারা শুধু দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসই করে না, এর পিছনে প্রচুর সময় এবং প্রাচুর্য ব্যয় করে, জীবন দান করে, এমনকি হত্যাও করে। আমরা অনেকে তা দেখে বিস্মিত হই, ঠিক যেমন বিস্মিত হই মথের আত্মবলি দেওয়া দেখে। আমরা ভাবতে থাকি, ‘কেন’? । কিন্তু আমার মতে আমরা এক্ষেত্রেও ভুল প্রশ্ন করছি।

হতে পারে, আজকে আমরা যে ধর্মীয় আচরনগুলো দেখি তা নিতান্তই কোন এক সময়ের মানুষের কোন এক মানসিক প্রবনতার দুর্ভাগ্যজনক অভিব্যক্তি, কিন্তু হয়তো সেই সময়ে এর কোন উপযোগিতা ছিল। প্রশ্ন হচ্ছে এই মানসিক প্রয়োজনটি কি হতে পারে? এবিষয়ে আমি একটি প্রস্তাব দিতে চাই, কিন্তু প্রস্তাবটি দেওয়ার আগে পরিষ্কার করে বলে নেওয়া প্রয়োজন যে এটি একটি উদাহরণ মাত্র। অমি মনে করি, এ বিষয়ে একটি বিশেষ কোন সিধান্তে পৌঁছানোর আগে আমাদের সঠিক প্রশ্নটি খুজে বের করা অনেক বেশী জরুরী।

আমার এই সুনির্দিষ্ট প্রকল্পটি হচ্ছে শিশুদের নিয়ে। অন্য যে কোন প্রজাতির চেয়ে আমরা, টিকে থাকার জন্য, পূর্ববর্তী প্রজন্মের অভিজ্ঞতার উপর অনেক বেশি নির্ভর করে থাকি। তত্ত্বগতভাবে, শিশুরা নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই শিখে নিতে পারে যে নদীতে কুমীর থাকলে সেখানে সাতার কাটতে হয় না। কিন্তু এটা ঠিক যে শিশুমস্তিষ্কে *‘বড়রা যা বলে তা বিশ্বাস করো, পিতামাতার কথা শোন, মুরুব্বিরা যখন গুরু গম্ভিরভাবে কিছু বলে তা প্রশ্নকরা ছাড়াই মেনে চল’* - এইধরনের কিছু নিয়ম বাধা আছে বলে তা থেকে আমরা অনেক বাড়তি সুবিধাও পেয়ে থাকি।

ছোটবেলায় স্কুলের ধর্মযাজকের শিখানো সেই ভয়ংকর উপদেশেটির কথা আমি কখনই ভুলবোনা। এটাকে আসলে ভয়ঙ্কর বলে মনে হয়েছে পরবর্তীকালে : সে সময়ে ধর্মযাজক যেভাবে চেয়েছিলেন আমার শিশু-মস্তিষ্ক সেভাবেই উপদেশটি গ্রহণ করেছিলো। একদল সৈন্যের রেল লাইনের পাশে কুচকাওয়াজ করার একটি গল্প বলেছিলেন আমাদের। একসময় তাদের নেতার দৃষ্টি অন্য কিছুতে আকর্ষিত হওয়ায় তিনি সৈন্যদেরকে থামার উপদেশ দিতে ভুলে যান। সৈন্যরা বিনাবাক্যে আদেশ মেনে নিতে এতই অভ্যস্থ ছিল যে তারা মার্চ করতে করতে চলমান ট্রেনের মুখে গিয়ে পড়ে। যদিও এখন আমি গল্পটি আর বিশ্বাস করি না, কিন্তু নয় বছর বয়সে ঠিকই বিশ্বাস করেছিলাম। যাজকটি চেয়েছিলেন আমরা যেন সৈন্যদের এই প্রশ্নাতীতভাবে আদেশ মেনে চলার রীতিকে, তা যত ই অযৌক্তিকই হোক না কেন, একটি আদর্শ হিসেবে মেনে নেই। এবং সত্যি কথা বলতে কি আমরা সে সময়ে

এটাকে একটা গুন বলেই মনে করতাম। আমি তখন আসলেই ভাবতাম দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে চলন্ত ট্রেনের মুখে পড়ার সৎসাহস কোনদিনও আমার হবে কিনা।

সুশিক্ষিত সৈন্যদের মত কম্পিউটারকেও যা বলা হয় তারা তাই করে থাকে। Programming Language এর মাধ্যমে তাদেরকে যা নির্দেশ দেওয়া হয় তারা আজ্ঞাবাহী গোলামের মতই তা পালন করতে থাকে। একদিকে কম্পিউটার আমাদের প্রয়োজনীয় অনেক কাজ করে দেয়, অন্যদিকে, এই আনুগত্যের অনিবার্য পরিনতি হিসেবে খারাপ নির্দেশাবলীকেও সে একইভাবে পালন করতে থাকে। কোনটি ভালো নির্দেশ আর কোনটি খারাপ নির্দেশ কম্পিউটার তা বুঝতে পারে না। সৈন্যদের মত তারাও শুধু নির্দেশ পালন করে যায়।

এই প্রশ্নাতীত বাধ্যতার ফলেই কম্পিউটার ভাইরাসের শিকারে পরিনত হয়। খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে লেখা একটি প্রোগ্রাম যখন কম্পিউটারকে তার ভিতরে লিপিবদ্ধ সব ঠিকানার তালিকা পাঠাতে নির্দেশ দেয় তখন সে তো তা পালন করেই, অন্য সব কম্পিউটার যাদেরকে সে এই প্রোগ্রামটি পাঠায় তারাও কাজটি একের পর এক অনুগতভাবে সম্পাদন করতে থাকে। এইভাবেই অত্যন্ত দ্রুত গতিতে ভাইরাসগুলো ছড়িয়ে পড়ে। এমনভাবে কোন কম্পিউটার বানানো সম্ভব নয় যা আমাদের কাজের বেলায় অনুগত থাকবে কিন্তু ভাইরাসের সামনে দুর্বল হবে না।

আমার উপরের ব্যাখ্যা যদি বোধগম্য হয়ে থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই আপনারা ইতি মধ্যেই শিশুমস্তিষ্ক এবং ধর্মের মধ্যকার যোগসূত্রটি আবিষ্কার করে ফেলেছেন। প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural Selection) একটি শিশুর চিন্তাধারাকে এমনভাবেই তৈরি করে যাতে সে মা বাবা এবং গোত্রের মুরুব্বিদের কথা বিনা দ্বিধায় বিশ্বাস করে। এবং এই বিশেষ গুণটিই অবচেতনভাবে তাকে আবার মানসিক ভাইরাসের আক্রমনের শিকারে পরিনত করে। শিশুমস্তিষ্ক - ভালোভাবে বেচে থাকার পূর্ব শর্ত হিসেবে - বাবা মা এবং মুরুব্বিদের বিশ্বাস করতে বলে। এর অনিবার্য পরিনতি হিসেবেই ‘বিশ্বাসকারীর’ পক্ষে ভাল উপদেশ এবং খারাপ উপদেশের মধ্যে পার্থক্য করার কোন উপায় থাকে না। শিশুর পক্ষে বুঝে নেওয়া অসম্ভব যে *‘নদীতে সাঁতার কেটো না, কুমীর খেয়ে ফেলবে’* একটি ভালো উপদেশ কিন্তু আবার *‘পূর্ণিমার সময় ছাগল বলি না দিলে শস্যহানি ঘটবে’* একটি খারাপ উপদেশ। দুটি উপদেশই তার কাছে একইরকম ভাবে তাৎপর্যময়। দুটি উপদেশই এসেছে এমন এক বিশ্বাসী লোকের কাছ থেকে যাকে শ্রদ্ধা এবং ভক্তি করা শিরোধার্য।

পৃথিবী, মহাশূন্য, নৈতিকতা, এবং মানবপ্রকৃতি সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। আবার যখন এই শিশুটিই বড় হয়ে ওঠে,তার নিজের ছেলেমেয়ে হয়, সে তখন স্বাভাবিকভাবেই তাদেরকে আরও সুচারুভাবে এইসব শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার চেষ্টা করে।

এই মডেল অনুযায়ী, আমরা দেখতে পাই, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকমের ভিত্তিহীন বিশ্বাসের ধারা পুরষানুক্রমিকভাবে বিকশিত হতে থাকে। এই অযৌক্তিক বিশ্বাসগুলো হয় এলোপাতাড়িভাবে (randon drift) ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে অথবা ডারউইনীয় নির্বাচনের মত কোন এক গতিতে বিকশিত হতে থাকে, এবং অবশেষে আমরা যে রূপটি দেখতে পাই তা তার আদি রূপ থেকে বিবর্তিত হতে হতে আনেকখানি বদলে গেছে। একইভাবে ভাষাও পর্যাপ্ত সময় এবং ভৌগলিক ব্যবধানের কারণে তার মুল উৎস থেকে সরে যেতে যেতে লক্ষনীয়ভাবে ভিন্ন রূপ ধারণ করে। একই জিনিষ দেখা যায় ধর্মের ক্ষেত্রেও, শিশুমস্তিষ্ককে সহজেই ছাঁচে ঢেলে বানানো যায় বলেই ধর্ম বংশ পরম্পরায় একজন থেকে আরেকজনের কাছে ক্রমাগতভাবে বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে।

ডারউইনীয় নির্বাচন শিশুমস্তিষ্ককে এমনভাবেই তৈরী করে যাতে তারা মুরুব্বিদের অন্ধভাবে বিশ্বাস করে; চিন্তাধারাকে এমনভাবেই সংগঠিত করে যেন বাচ্চারা একদিকে অনুকরন প্রবণ হতে, অন্যদিকে গুজব, রূপকথা এবং ধর্মে বিশ্বাস করতে প্রবৃত্ত হয়। **বংশগতিক নির্বাচনই (genetic selection) আমাদের মস্তিষ্ককে এভাবে তৈরী করেছে এবং এখান থেকেই non genetic এক বংশগতনীতির উদ্ভব হয়েছে - যা থেকে হয়তো নতুন এক ধরনের মহামারী কিংবা non genetic (বংশগতনীতির অধীন নয় এরকম) এক ডারউইনীয় নির্বাচনের ভিত্তি তৈরী হবে। আমি মনে করি ধর্ম এমনি এক দলগত ঘটনা যাকে non genetic মহামারী এবং ডারউইনিয় নির্বাচনের সংমিশ্রন দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়।** আমার এই প্রকল্প যদি ঠিক হয়ে থাকে, তাহলে ব্যক্তিগতভাবে মানুষের বেচে থাকার জন্য এমনকি তাদের জীনের জন্যও ধর্মের কোন ভুমিকা বা উপকারীতা নেই। এর যদি কোন উপকারীতা থেকেই থাকে তা মানুষের প্রয়োজনে নয়, তা শুধুই ধর্মের নিজের টিকে থাকার প্রয়োজনে।

---

* Richard Dawkins is the Charles Simonyi Professor of the Public Understanding Of Science at Oxford University. One of the most influential scientists of our times, Dawkins "climbs mental Everest," the *Times Educational Supplemental* has proclaimed. The author of bestsellers such as *The Selfish Gene* and The Blind Watchmaker, Dawkins has been called " one of the most incisive science writers alive"(New York times Book Review) .

পাঠকের মতামত পাঠনোর ঠিকানাঃ
mm_publication@yahoo.com,
mukto-mona@yahoogroups.com